গত দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মৈত্রীশ ঘটকের একটি সাক্ষাৎকার

গত ১ জানুয়ারি ২০২৬-এ অধ্যাপক মৈত্রীশ ঘটকের একটি সাক্ষাৎকার গৃহীত হয় মার্কসবাদী পথ-এর পক্ষ থেকে। এই সংখ্যায় সেই সাক্ষাৎকারের লেখ্যরূপ প্রকাশিত হল।

মার্কসবাদী পথ: আমাদের আলোচনার বিষয়— গত দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মৈত্রীশ ঘটক। অধ্যাপক ঘটক লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স-এ অধ্যাপনা করেন, একই সঙ্গে তিনি প্রাবন্ধিকও বটে। আমরা শেষ সেনসাস পেয়েছি ২০১১ সালে। তারপর প্রায় ১৫ বছর কেটেছে। এর মধ্যে নানা সমীক্ষা হচ্ছে, প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাইব, সংক্ষেপে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থাটার যদি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে আপনার মতামত কী হবে?

মৈত্রীশ ঘটক: এটা ঠিকই যে সেন্সাস ২০১১-এর পরে হয়নি এবং এখন যা মনে হচ্ছে ২০২৭-২৮-এ হয়তো আবার বেরোবে। কিন্তু সেন্সাস থেকে আমরা জনসংখ্যার, মানে মোট জনসংখ্যা এবং গ্রাম ও শহরে তার অনুপাত— এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারি। রাজ্যগুলোর মধ্যেও তাদের আপেক্ষিক জনসংখ্যা বেড়েছে না কমেছে সেগুলো খানিকটা ধরা পড়ে, যেমন মাইগ্রেশন ইত্যাদি। কিন্তু আপনি বৃহৎ অর্থে যে কথাটা বলছেন সে কথাটা ঠিকই যে, একটা রাজ্যের বা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা মূল্যায়ন করতে গেলে কিছু কন্টিনিউয়াস ডেটা সিরিজের দরকার হয়। তা না হলে লাইক ফর লাইক তুলনাটা হয় না। আমাদের এমনিতে অর্থনীতির অবস্থার যে মূল সূচকগুলো, সেটা নিয়েও উন্নয়নের প্রায় একটা গোটা কোর্সই পড়িয়ে দেওয়া যায়। অর্থাৎ রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের অল্টারনেটিভ ইন্ডিকেটর নিয়ে। কিন্তু অধিকাংশ সময় আলোচনায় আসে জাতীয় আয় বা রাজ্যের ক্ষেত্রে যেটাকে নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট পার ক্যাপিটা মানে রাজ্যের মাথাপিছু আয়। তার থেকে সামগ্রিকভাবে কত উৎপাদন হচ্ছে তার একটা ধারণা পাওয়া যায় এবং উৎপাদন থেকেই তো আয় জেনারেটেড হয়। কিন্তু সেটা বাদ দিয়েও ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে (এনএসএস)-এর কনজিউমার এক্সপেন্ডিচার সার্ভেগুলো থেকে জীবনধারণের মান আরো প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা যায়। কনজিউমার এক্সপেন্ডিচার সার্ভেগুলোর আওতায় যে পরিবারগুলো আসে তাদের অ্যাকচুয়ালি সার্ভে করে একটা পুরো রেঞ্জ-এ – একদম দরিদ্র থেকে তুলনায় উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোর মাসিক খরচের একটা প্যাটার্ন — সেটা থেকে জনসাধারণের জীবনযাপনের মানের একটা ধারণা করার চেষ্টা করে। শুধু তাই না, মূল্যবৃদ্ধির হার বার করার জন্যেও এই সার্ভেগুলো প্রয়োজনীয়। এই সমীক্ষাটা পাঁচ-ছয় বছর অন্তর অন্তর হতো আগে, তারপরে আপনি যেটা সেন্সাস নিয়ে বললেন সেটা হয়তো এই ক্ষেত্রে আরও প্রাসঙ্গিক— ২০১১-১২-র পরে ২০১৭-১৮-তে এই সার্ভের একটা রাউন্ড বেরোবার কথা ছিল, তবে সেটার ফলাফল বেরোয়নি। কিন্তু গত দু-বছর হলো আবার বেরোচ্ছে। শুধু তাই নয়, এখন প্রত্যাশা হল প্রতি বছরই বেরোবে। এই যে বেরিয়েছে সেটা খুব ওয়েলকাম নিউজ। তা না হলে রোগীর যেমন ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট লাগে, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এটা না হলে যার যেটা মনে হচ্ছে, সেরকম সবই কনজেকচার হয়। সেই কারণে এই ব্যাপারগুলো যত্ন করে বিশ্লেষণ করতে হয় এবং স্বল্প পরিসংখ্যান যা অ্যাভেলেবল তার কম্প্যারেবিলিটিটাও ভাবতে হয়। আপনি যে কোনো দুটো বছরের মধ্যে হঠাৎ তুলনা করে দিলেন কিন্তু তার মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির কম্পোজিশন চেঞ্জ হচ্ছে (যেমন, কৃষি থেকে শিল্প থেকে পরিষেবা ইত্যাদি) সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে। এটা একটু তাত্ত্বিকভাবে বললাম কিন্তু কংক্রিট আলোচনায় এলে, আমরা আজকে দুটো বিষয়কে ফোকাসে রাখতে পারি। একটা হল— রাজ্যের এনএসডিপি অর্থাৎ নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। আমরা ৬০-এর দশকের গোড়া থেকে মোটামুটি একটা কন্টিনিউয়াস সিরিজ বার করতে পারছি সরকারের পরিসংখ্যান থেকে। সেখানে যেটা যত্ন করে করার চেষ্টা করেছি, এই যে বিভিন্ন সিরিজগুলো পাওয়া যায়, এখানে বছর দশেক অন্তর অন্তর বেস ইয়ার-টা পাল্টে দেওয়া হয়। আপনি যদি দেখেন, ধরুন পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৬০-৬১ একরকম (এখানে ৬০-৬১ হলো ফিসক্যাল ইয়ার, মানে এপ্রিলের গোড়ায় শুরু মার্চের শেষে শেষ), কিন্তু তারপরে হঠাৎ ৭৪-৭৫-এ গিয়ে আপনি দেখবেন যে ওটা যে নম্বরগুলো দিচ্ছে সবই টাকায়, কিন্তু প্রাইসেস হয়ে গেছে আবার পরের একটা বছরের প্রাইস। ফলে দুটোকে আপনি তুলনা করতে পারবেন না। এটা একটু টেকনিক্যাল শোনালেও এই জিনিসটা যত্ন করে করা সম্ভব। মানে আমরা যা করেছি তা যে বিশাল উদ্ভাবনী ক্ষমতার অভিব্যক্তি, তা নয়। কিন্তু এটা পরিশ্রম করে করতে হয়।

সেটা করে দেখা যাচ্ছে, তাহলে একটা ন্যারেটিভ বেরোচ্ছে যা অনেকের কাছেই পরিচিত – যে, ৬০-এর দশকের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় গড়ের খুব কাছাকাছি ছিল। রাজ্যগুলোরও যদি আমরা র‍্যাংকিং দেখি, ৬০-এর দশকের দিকে পশ্চিমবঙ্গ উপরের দিকের রাজ্য ছিল, প্রথম ৫-৬টার মধ্যে। সেটা থেকে একটা সেকুলার ডিক্লাইন শুরু হয় এবং এটা ভাবুন ৬০-এর দশকের গোড়া থেকেই হচ্ছে। তার মধ্যে অবশ্যই ওঠা-নামা আছে। তারপরে ৯০-এর গোড়া থেকে একটা আপওয়ার্ড ট্র্যাজেক্টরি দেখা যাচ্ছে। আপনার সামনে যে গ্রাফটা আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতেরটা ১০০ ধরে তার তুলনায় পশ্চমবঙ্গের আপেক্ষিক মান কতটা কমছে আবার কতটা বাড়ছে।

দেখা যাচ্ছে, ২০০৫ অবধি আবার একটা অ্যাপারেন্ট রিভাইভল হল। তখনও ভারতীয় গড়ের তলায়, কিন্তু আগের তুলনায় একটা আংশিক রিভাইভল হল, কিন্তু ২০০৫-এর পর থেকে মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু এনএসডিপি ভারতের মাথাপিছু এনএসডিপির অনুপাত হিসেবে টানা আবার নামছে। এখন নামছে মানে এমন নয় যে এটা তলানিতে ঠেকেছে। এই একদম শেষ বছরে যদি দেখেন এখন ভারতের যদি ১০০ হয়, পশ্চিমবঙ্গের ৮৫ হচ্ছে বা ৮৪ হচ্ছে। সেখানে ৬০-এর দশকে প্রায় ১০০-র কাছাকাছি ৯৮, ৯৯ দেখা যাচ্ছে আপেক্ষিকভাবে। মানে ভারতের যদি গড় আয় ১০০ টাকা হয় পশ্চিমবঙ্গের গড় আয় হচ্ছে ৮৪-৮৫ টাকা হচ্ছে কারেন্টলি, যেটা মাঝে রিকভারি হয়েছিল। ফলে এটা একটা ইন্ডিকেটর। আপনি যদি জানতে চান কেন হল, কী কারণে হল, কোন নীতির জন্য হল সেখানে মনে রাখতে হবে কোনও সরকারি নীতি বাদ দিয়েও, আর্থিক পরিবেশও কাজ করে। দেশের আর্থিক পরিবেশ, বিশ্বের আর্থিক পরিবেশ, প্যান্ডেমিকের সময় সব জায়গায় জাতীয় বা রাজ্যের আয় পড়ে গিয়েছিল তারপর আবার খানিকটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে, সেগুলো সবই কাজ করছে । আর অন্য একটা সূচক আমার মনে হয় দেখা দরকার, সেটা হচ্ছে দারিদ্র নিয়ে।

এনএসএস-এর সেই সার্ভেটাকে এখন এইচসিইএস সার্ভে বলে অর্থাৎ হাউসহোল্ড কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার সার্ভে। তাতে প্রায় ৫০-এর দশকের গোড়া থেকে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় কিন্তু সেখানেও গৃহীত তথ্যের এবং স্যাম্পলের কভারেজ-এর কম্পেয়ারেবিলিটির সমস্যা আছে। এগুলো টেকনিক্যাল শোনাচ্ছে, কিন্তু আপনি ভাবুন ১৯৫০-এ মাধ্যমিকে যিনি নম্বর পেয়েছেন যত, তার সাথে ১৯৮০-তে কেউ যা পেয়েছে আবার তার সাথে যে ২০২৫-এ কেউ যা পাচ্ছে বুঝতেই পারছেন যে, নম্বরগুলো কম্পেয়ারেবল হবে না, মানে কার কৃতিত্ব কতটা বোঝা যাবে না। এখানেও ব্যাপারটা খানিকটা তাই। অ্যাপারেন্টলি টাকাতেই অঙ্কগুলো, কিন্তু ডিরেক্টলি কম্পেয়ারেবল না। এক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতিবিদ হিসেবে খুব সাবধানী হতে হয়। যাই হোক, দারিদ্র রেখা যেভাবে মাপা হয় সেটা হলো একটা মিনিমাম কনজাম্পশন বাস্কেটের মনিটারি ভ্যালু বার করা যা গ্রামাঞ্চলে শহরাঞ্চলের তুলনায় কম হবে কারণ ওখানে জিনিসের দাম কম। বেশি হবে। দারিদ্র রেখা এভাবে ধার্য করা হয়। সুরেশ তেন্ডুলকর, যিনি তেন্ডুলকর কমিটির হেড ছিলেন, মারা গেছেন কিছু বছর আগে, আমার অধ্যাপক-ও ছিলেন, তাঁর যে ধার্য করা লাইন সেটাকেই এখনও ব্যবহার করা হয়। এখন এটাও কিন্তু ঘটনা যে যাঁরা দারিদ্র নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা মনে করেন এটা খুব রক্ষণশীল লাইন। ওটাতে দেখা হচ্ছে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে যদি দিনে ১৮০০ ক্যালোরি দিতে পারে এমন খাবার খেতে হয় তাহলে সবচেয়ে কম খরচে সে কীভাবে খেতে পারে। আমার অন্য একটা কাজে সেটা সারা ভারতের ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ স্পেসিফিক না, আমরা এই দাম বেড়েছে না কমেছে, তার ফলে দারিদ্র আসলে বেড়েছে না কমেছে বুঝতে গিয়ে আমরা আমারই বাড়ির খিচুড়ির রেসিপি সেটা সবচেয়ে কম খরচের উপাদানে বানিয়ে এবং মিনিমাম কোনও তরকারি রেখে ওই ১৮০০ ক্যালোরি করে এবারে কোন জায়গায় কী দাম সেটা দিয়ে একটা দারিদ্র রেখা বানিয়েছি। সুতরাং তেন্ডুলকরেরটাও খানিকটা তাই। যদিও যেটা বললাম এক্স্যাক্টলি তা না। আরও কিছু কনসিডারেশন আছে, কিন্তু সেটা একটু বেশি টেকনিক্যাল হয়ে যাবে। তেন্ডুলকরের লাইনের হিসেবে আপনি যদি এই পভার্টির বিষয়টা দেখেন, এবং গ্রাফে যে পয়েন্টগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলো বিভিন্ন রাউন্ড অফ এনএসএস সার্ভে থেকে পাওয়া যাচ্ছে । প্রতি বছর তো হয় না, মোটামুটি পাঁচ-ছ বছর অন্তর অন্তর তাই জন্য এটা কন্টিনিউয়াস সিরিজ না। আমরা নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে মোটামুটি তুলনা করার মতো ডেটা পাচ্ছি। ফলে নব্বইয়ের দশকের গোড়া, তারপর ২০০৪-০৫-এর একটা আছে, তারপরে ২০১০-১১। তারপরে ২০১৭-১৮-তে যদিও সেই এনএসএস-এর রিপোর্টটা বেরোয়নি, কিন্তু তার একটা সংক্ষিপ্ত ভার্সন একজন জার্নালিস্ট কোনওভাবে বার করে ফেলেন। তার ভিত্তিতে কিছু বিশেষজ্ঞ মোটামুটি রেসপেক্টেবল জায়গাতেই তার একটা বিশ্লেষণ করেছেন। সেই তথ্যটাও এখানে আছে।

এখন সেটা আমরা নেব কি নেব না সেটা আলাদা কথা। আর একদম সাম্প্রতিককালে পরপর দুবছর আবার এই সমীক্ষার রিপোর্ট বেরিয়েছে তার প্রথম বছরটা (২০০২-২৩) নিয়ে ইতিমধ্যে কিছু বিশেষজ্ঞ দারিদ্র রেখার তলায় জনসংখ্যার অনুপাত কম্পিউট করেছে। যদি আমরা এই রূপরেখাটা দেখি তাহলে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু সবসময় ভারতের থেকে একটু এগিয়ে আছে - ভারতের দারিদ্র রেখাটা পশ্চিমবঙ্গের রেখার ওপরে দেখতে পাচ্ছি আমরা। মানে

রাজ্যে দারিদ্র তুলনায় কম। দেখুন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের দারিদ্র হ্রাসের হারটা বাড়ছে বলে তা প্রায় পশ্চিমবঙ্গকে ধরে ফেলছে।

২০১৭-১৮-তে ওইজন্যেই এটা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে যে, এতে স্যাম্পলিং মেথডলজির কোনও সমস্যা ছিল কিনা ইত্যাদি। তখন দেখা যাচ্ছে ভারতেরটা প্রায় একই আছে শুধু না, মার্জিনালি বেড়েও থাকতে পারে এবং যদি সত্যিই হয়, তাহলে তার পেছনে তখন ডিমোনেটাইজেশন ইত্যাদি অনেকগুলো ধাক্কা এসেছিল সামগ্রিক অর্থনীতিতে। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র কিন্তু খানিকটা বেশি হারে পড়েছিল। ফলে ওই সময়কালটা ধরলে আপনি যদি সাম্প্রতিক দশকে এটার রূপরেখাটা দেখেন দ্যাট ওয়াজ আ পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট টু দ্য এক্সটেন্ট ইউ কন্সিডার দ্যাট পার্টিকুলার সিরিজ টু বি রিলায়েবল। কিন্তু একদম শেষ বছর যেটা নিয়ে খানিকটা প্রামাণ্য ইন্ডিকেটর অ্যাভেলেবল আছে, এবং এই ডেটাটা অফিশিয়ালি পাবলিশড, সেটা হচ্ছে ২০২২-২৩-এর এইচসিইএস সার্ভের ডেটাটা। তারপরেও আর একটা বেরিয়েছে কিন্তু সেটাতে এখনও দারিদ্র রেখার ক্যালকুলেশন সাধারনের জন্য প্রকাশিত হয়নি। সেটা এখনও হাতের কাছে নেই বলে এখানে রাখিনি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্ররেখার তলায় জনসংখ্যার অনুপাত এখন ভারতের থেকে মার্জিনালি বেশি। ফলে আপনি যদি মাঝের বছরটা দেখেন যেটাতে রিপোর্টটা প্রকাশিত হয়নি, সেটাকে অগ্রাহ্য করলে মনে হবে যে, ভারত আর পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যে কাছাকাছি চলে এসেছিল, তাহলেও ২০১১-১২-তে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের চেয়ে একটু বেটার ছিল। এখন সেটা খানিকটা ঘুরে গেছে। কম হলেও ঘুরে গেছে।

মার্কসবাদী পথ: আমি একটু জানতে চাইছি, এই গ্রাফটার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দারিদ্রের যে লাইনটা দেখাচ্ছে, সেটার খুব ওঠাপড়া নেই; ভারতেরটা বরং অনেকটা উঠে আবার বেশ খানিকটা নেমেছে…

মৈত্রীশ ঘটক**:** আপনি সঠিকভাবেই লক্ষ করেছেন। আপনি যদি দেখেন যে, নব্বইয়ের গোড়া থেকে ২০০৪ অবধি যে রেখাটা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খানিকটা ফ্ল্যাট এবং ভারতের দারিদ্র হ্রাসের হারটা তার থেকে মার্জিনালি বেশি, যদিও পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র সারা দেশের তুলনায় কম **।** কিন্তু দুটো রেখাই তারপর খানিকটা ফ্ল্যাট তারপর একটা শার্প ডিপ হয়েছে দুটো জায়গাতেই। ২০১১-১২-তে যখন মাপা হচ্ছে তখন দুটোর মধ্যেই একটা শার্প ডিক্লাইন করেছে। তার অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন একটা আছে যে, যদিও সেই অবধি সিরিজটা আমাদের নেই, আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র হ্রাসের হারটা বেটার হয়েছিল। তার কারণ সেই সময় কিছু গ্রামীণ সংস্কার ইত্যাদি হয়েছিল। সেগুলো নিয়ে, মানে তার কার্যকারণ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কম্পেয়ারেবিলিটি-র জন্য এই গ্রাফে আমরা রাখিনি, তবে যদি আশির দশকের গোড়া অবধি সিরিজটা এখানে থাকত, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম যে, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে ভারতের তুলনায় দারিদ্র হ্রাস খানিকটা বেশি হয়েছিল। তারপরে আপনি যদি দেখেন নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে, অর্থাৎ সেটা উদারীকরণের পরের জামানা, সেখানে দারিদ্র কমছে দেশে ও রাজ্যে এবং সেটা নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে যে এটা কতটা রিয়েল, আসলে কি মানুষের অবস্থার মান অতটা বেড়েছে, দ্রব্যমূল্য আমরা পুরোপুরি কন্ট্রোল করতে পারছি কিনা— এসব নিয়ে বিতর্ক বা ভিন্নমত আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যে স্ট্যান্ডার্ড মেথড অফ ক্যালকুলেশন তাতে দেখা যাবে যে, নব্বইয়ের দশক থেকে মোটামুটি ২০০৪-০৫ সাল অবধি একটা হ্রাস হয়েছে। কিন্তু খুব শার্পলি হয়নি। মানে সারা ভারতে তো দেখাই যাচ্ছে ৪৫ থেকে সেটা পড়ে ওই ৩৮ মতো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ৪০-এর জায়গায় ছিল তার থেকে কমে ৩৫ মতো হয়েছে। তারপরে খানিকটা শার্পলি ডিক্লাইন করে রাজ্যে ও দেশে প্রায় এক জায়গাতেই ২০১১-তে। আর আমরা যদি শেষ বছরটা দেখি তারপরে ভারতেরটা আর একটু শার্পলি ডিক্লাইন করেছে। এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারত দারিদ্র দূরীকরণে অল্প হলেও খানিকটা এগিয়ে গেছে।

মার্কসবাদী পথ: ধন্যবাদ আপনাকে এই সামগ্রিক আলোচনার জন্য। এবার আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাইছি একটু সুনির্দিষ্টভাবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকে আরও বোঝার জন্য। প্রথমেই এক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করব কর্মসংস্থানের কথা। কর্মসংস্থান যেহেতু অর্থনীতির সঙ্গে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা একটা বিষয় এবং এর সঙ্গে মানুষের জীবিকা, পেশা, সঙ্গে তার জীবনযাত্রার মান সবটাই জড়িয়ে, তাই এই প্রশ্ন— পশ্চিমবঙ্গের এই গত কয়েক বছরে কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে আপনার পর্যবেক্ষণ। এবং এর সঙ্গে আর একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে আসছে, সেটা হল শ্রমিকের প্রবাস-যাত্রা, প্রবাসে গিয়ে কাজ করা— মাইগ্রেশন। এই মাইগ্রেশন সম্পর্কে আপনার কী মতামত? এটা কি কেবলই নিজভূমে যথেষ্ট রোজগারের উপায় রয়েছে, বুনিয়াদি সচ্ছলতার উপায় রয়েছে, তা সত্ত্বেও আরও একটু ভালো জীবনযাত্রার মানের জন্য তাঁরা অন্যত্র যাচ্ছেন— সে ভিন রাজ্যে হোক, ভিন দেশে হোক, যেখানেই হোক— কেবল কি এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়, নাকি এর মধ্যে কিছু নিরুপায়তা রয়েছে, যে নিরুপায়তার সঙ্গে আনএমপ্লয়মেন্ট বলুন বা আন্ডারএমপ্লয়মেন্ট বলুন, কোনও না কোনওভাবে জড়িয়ে? এ সম্পর্কে আপনার কী মতামত গত এই কয়েক বছরের সাপেক্ষে?

মৈত্রীশ ঘটক: ভালো প্রশ্ন। আপনি তো জানেন যে, আমাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য তথ্যের সূত্র হল পিএলএফএস, পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে। এর আগে এনএসএস-এর (NSS) কনজিউমার এক্সপেন্ডিচার সার্ভের কথা তো বললাম, তাদেরই এমপ্লয়মেন্ট-আনএমপ্লয়মেন্ট সার্ভে বলে একটা রিপোর্ট প্রকাশ হত। সেটা শেষ বেরিয়েছিল ২০১১-১২ সালে। তারপর ২০১৭-১৮ থেকে পিএলএফএস। পিএলএফএস-এর থেকে আপেক্ষিক যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, আমার কাছে তথ্যগুলো আছে কিন্তু এই মুহূর্তে মানে গ্রাফ বা টেবিল আকারে নেই বলে আমি খানিকটা আন্দাজে স্মরণ করছি। আপনিও দেখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ আর ভারতের গড়ের খুব একটা তফাত নেই। হয়তো কিছু কিছু ইন্ডিকেটরের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ মার্জিনালি বেটার এইরকমই। অর্থাৎ আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট, মহিলাদের লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট — যে স্ট্যান্ডার্ড সূচকগুলো দেখা হয়। কিন্তু এখানে একটা কথা বলতেই হবে যে, সেটা হয়তো সারা ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এই পরিসংখ্যানগুলো আমাদের খুব সাবধানে ইন্টারপ্রিট করতে হয়। আমরা আনএমপ্লয়েড বলতে সাধারণভাবে কী বুঝি? যারা চাকরি খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না। এবং এমপ্লয়েড তারা, যারা চাকরি পেয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের লেবার ফোর্স-এর প্রায় ৯০ শতাংশ আনঅরগানাইজড সেক্টর-এ নিযুক্ত অর্থাৎ যারা অফিস যাচ্ছে বা ফ্যাক্টরি-তে যাচ্ছে— আগে যেমন বলা হত চাকরি পেয়েছে, কারখানায় কাজ করে বা অফিসে কাজ করে সেই বর্ণনাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন প্রযোজ্য নয়। এখন আমরা যাদের এমপ্লয়েড হিসেবে ক্লাসিফাই করি, তাদের মধ্যে কিন্তু চায়ের দোকান বা ফুটপাতে বসে ফল বিক্রি করছে বা লোকের বাড়িতে কাজ করছে, এগুলো সবই ধরা হবে। এবং তাতে নীতিগত আপত্তিও নেই। কারণ আপনি অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম এবং খানিকটা রোজগার করতে পারছেন। কিন্তু বিদেশেই যেমন আনএমপ্লয়েড-এমপ্লয়েড ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে ইন্টারপ্রেট করা হয়— সেটা অনেকটা আমাদের এখানে প্রচলিতভাবে যা মনে করা হয় অর্থাৎ চাকরি আছে না বেকার সেরকম। এখানে যেকোনও ধরনের আর্থিক অন্নসংস্থানের যে পথ সেটাকেই এমপ্লয়েড থাকা ধরা হবে। শুধু তাই না, গত কিছু বছর ধরে যেটা সারা দেশে আমরা দেখছি যে আপাতদৃষ্টিতে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশান রেট-টা বেড়েছে এবং বিশেষভাবে নারীদের মধ্যে বেড়েছে। এখন সারা পৃথিবীর সব জায়গাতেই যদি আর্থিক উন্নয়নের চালচিত্র দেখেন, সেটা ভালো খবর। একদিক থেকে মহিলারাও কাজ করছেন, তাঁদের পরিবারেরও সচ্ছলতা বাড়ছে, নারীর স্বাধীনতার দিক থেকেও সেটা ভালো। ফলে সেই প্যাটার্নটা কাম্যও বলা যেতে পারে। আমাদের এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে, লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশান রেট বাড়ছে এবং তুলনায় আনএমপ্লয়মেন্ট রেট-টা অতটা উদ্বেগজনক লাগছে না। সেটা সারা দেশের ক্ষেত্রেই বলছি। কিন্তু আনপেইড ডোমেস্টিক হেল্প এই ক্যাটেগরিতে নিয়োজিত শ্রমিকের অনুপাত অনেকটা বাড়ছে। বা নিজের চালানো এন্টারপ্রাইজ। ধরা যাক, কোনও বাড়িতে কোনও পুরুষের হয়তো চায়ের দোকান আছে, তাঁর স্ত্রী হয়তো লোকের বাড়ি কাজ করছেন বা দোকানের সামনে তরকারি বিক্রি করছেন, সেটার একটা রাইজ হচ্ছে। ফলে এখন সেটা ভালো না মন্দ সেটা আমরা আলোচনা করতে পারি। কিন্তু আরও ইন্টারেস্টিংলি বাবার চায়ের দোকানে ছেলে বা মেয়ে হেল্প করছে এবং সে আপাতভাবে কোনো মজুরি পাচ্ছে না কারণ আয় পরিবারেরই, সেই রেটটা বাড়ছে, সে ব্যাপারটাও বাড়ছে এবং সেটা কতটা কাম্য সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

মার্কসবাদী পথ: তাঁরাও এমপ্লয়েড…

মৈত্রীশ ঘটক: হ্যাঁ, তাকেও এমপ্লয়েড ধরা হবে। এবং সেইটা কি কাম্য? মানে তাকে কি সত্যি এমপ্লয়েড বলা যায়? এক দিক থেকে সত্যি, মানে বাই ডেফিনিশন সত্যি। সে তো বাড়িতে বসে থাকছে না, সে কিছু না কিছু করছে। কিন্তু আমরা যে অর্থে আর্থিকভাবে একজন কর্মে নিযুক্ত এটাকে যেভাবে ইন্টারপ্রেট করি— যে তার কিছু একটা আয় আছে, সে এক ধরনের স্বাধীনতা পাচ্ছে, এখানে একটু গ্রে এরিয়া আছে। এটা হল আপনার প্রশ্নের উত্তরের প্রথম অংশ— পিএলএফএস-এর বিষয়টা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে। আশা করি আমাদের যে সামগ্রিক গবেষণার কাজ চলছে দেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আপেক্ষিক অবস্থান, সেটা নিয়ে হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে আমার কাছে দেখানোর মতো কিছু প্রামাণ্য তথ্য-পরিসংখ্যান আমরা পেশ করতে পারব।

আপনি যে অন্য বিষয়টা বললেন অর্থাৎ পরিযায়ী শ্রমিক, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার নিয়ে আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি প্রতি বছর স্টেট অফ ওয়ার্কিং ইন ইন্ডিয়া রিপোর্ট বার করে, যেটা অনেকটাই পিএলএফএস নিয়ে। সম্প্রতি 'ই-শ্রম' বলে একটা ডেটাবেস পোর্টাল হয়েছে যাতে অসংঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা রেজিস্টার করলে কিছু কিছু সরকারি প্রকল্পের সাহায্য পায়। তার মধ্যে বীমা আছে, সুরক্ষামূলক প্রকল্প আছে। এই ই-শ্রমে প্রায় এখন কভারেজ ৩০ কোটি মতো, যেখানে আনুমানিকভাবে ৪০ কোটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক আছে। আজিম প্রেমজির একজন গবেষক, তমোঘ্ন হালদার, তাঁর সাথে আমি এখন এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি। ওঁদের একটা বৃহত্তর টিম আছে যাঁরা এই রিপোর্টটি নিয়ে কাজ করছেন, তমোঘ্ন ও তাঁরা এই ডেটাসেটটা তৈরী করেছেন এবং তার বিশ্লেষণ করছেন। আমি ডিরেক্টলি সেই বৃহত্তর কাজটার সাথে যুক্ত নই, তবে তমোঘ্নের সাথে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনামূলক মাইগ্রেশন প্যাটার্নটা

নিয়ে একটা গবেষণাপত্র লিখছি। সেটা থেকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং কিছু প্যাটার্ন দেখতে পেয়েছি। আর উল্লেখ করা উচিত যে এনএসডিপি এবং দারিদ্র নিয়ে যা বললাম আগে, তা বস্টন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং আইআইএম কলকাতার অধ্যাপিকা তনিকা চক্রবর্তীর সাথে মিলে আমরা আরেকটা গবেষণাপত্রের কাজ করছি, তার অংশ। এবং আশা করছি, সামনের দু-তিন মাসের মধ্যে ইকোনমিক অ্যান্ড পোলিটিক্যাল উইকলি-তে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা বেরোতে যাচ্ছে, তাতে এই দুটি গবেষণাপত্র ছেপে বেরোবে। তমোঘ্নের সাথে কাজে আমরা যে প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছি তা হলো, সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক পাঠাচ্ছে যে রাজ্যগুলো সেগুলো হল উত্তরপ্রদেশ, বিহার, এবং পশ্চিমবঙ্গ। এই গ্রাফটা বোধহয় দেখালে সেটা আর একটু পরিষ্কার করে বোঝানো যাবে। এটাকে নেট মাইগ্রেশন প্যাটার্ন বলে।

আমরা যে ফিগারটা প্রেজেন্ট করছি তাতে খেয়াল রাখতে হবে যে সব রাজ্যেই কিছু লোক চাকরি করতে আসে, আবার কিছু লোক সেই রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। ঠিক আমদানি-রপ্তানির মতো। একটা দেশ আমদানিও করে, রপ্তানিও করে। আসল প্রশ্নটা হল নিট অঙ্কটা কী রকম। আমদানি বেশি করছে, না বেশি রপ্তানি হচ্ছে। এই ফিগারটি থেকে রাজ্যগুলোর যে তালিকা আছে, সেখানে দেখা যাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আউট মাইগ্রেশন হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে, বিহারে তারপরই পশ্চিমবঙ্গ, তারপরে মধ্যপ্রদেশ, আসাম, ওড়িশা ইত্যাদি। আর সবচেয়ে বেশি ইন মাইগ্রেশন হচ্ছে মহারাষ্ট্র তারপরে হরিয়ানা, দিল্লি, গুজরাট, পাঞ্জাব ইত্যাদি রাজ্যে। এখানে অবজেক্টিভিটির খাতিরে আবারও যেটা বলা উচিত, যে রাজ্যগুলো থেকে আউট মাইগ্রেশন বা ইন মাইগ্রেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা কিন্তু পপুলেশন অ্যাডজাস্টেড নয়। এর আগে এনএসডিপি ইত্যাদি নিয়ে যেগুলো আমি বলছিলাম সেগুলো মাথাপিছু। ফলে এখানে একটা বিষয় আছে যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এগুলো জনবহুল রাজ্য। কিন্তু তাহলেও আপনি যদি পপুলেশন দিয়েও বিচার করেন ফিগারটা দেখে একটা কারেকশন-ও করে নেন যে, ভারতের জনসংখ্যার কোনও রাজ্যেরটা ১ ধরে, এবার যে রাজ্যে বেশি তারটা ১.২ হবে যারটা কম তারটা ০.৮ হবে— এইভাবে যদি এই সংখ্যাগুলোকে আপনি অ্যাডজাস্ট করে দেন, তাহলেও দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রমিক বাইরে বেশি হারে কাজ করতে যাচ্ছে। যেটা ইন্টারেস্টিং, সেটা হল আপনি যদি দেখেন কোন কোন সেক্টরে মাইগ্রেশান হচ্ছে। প্রথম কথা হচ্ছে, 'ই-শ্রম' ডেটাবেসের অন্তর্ভুক্ত যে মাইগ্রান্টরা, তাদের মধ্যে গড় শিক্ষাগত যোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সারা ভারতের তুলনায় একটু কম।

কিন্তু আমার মতে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হল— কোন কোন সেক্টরে কাজের জন্য রাজ্যের বাইরে যাচ্ছে? কী ধরনের কাজ করতে যাচ্ছে? তারা কি আইটি সেক্টরে যাচ্ছে, নাকি তারা অন্য ধরনের কাজে যাচ্ছে? এখানে এই গ্রাফটা যদি দেখেন, দেখতে পাওয়া যাবে যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট শিল্প বা সেক্টরে মানুষ যাচ্ছে, কনস্ট্রাকশান আর ক্যাপিটাল গুডস আর ম্যানুফ্যাকচারিং-এ ভারতের বাকি অংশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে গড়ে আউটমাইগ্রেশন বেশি হচ্ছে।

তাহলে এগুলো মেলালে কী পাওয়া যাচ্ছে? কনস্ট্রাকশান-এর ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারি, যখনই কোনও রাস্তা বা ব্রিজের কাজ চলছে বা পরিকাঠামোগত কাজ চলছে সেখানে কাজ করছেন যে মজুর, সেটা কনস্ট্রাকশান সেক্টর— শুধু তারা যে আক্ষরিক অর্থে ইট তুলছেন তা না, অনেক ধরনের কাজই হতে পারে, যাতে স্কিল লেভেল-এর তফাৎ থাকে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এইসব ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেগুলো হাই গ্রোথ স্টেটস বা ডেসটিনেশনস যেমন মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যে তারা যাচ্ছে। সেই প্যাটার্নটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এইটা হচ্ছে পরিসংখ্যান যা বলছে তাই। এবার এটার ইন্টারপ্রিটেশন, সেটা ভালো না খারাপ, অন্যরকম কী হতে পারত— সেসব তো আলোচনার বিষয় কিন্তু পরিসংখ্যান এইটা বলছে।

মার্কসবাদী পথ: মানে খুব সুনির্দিষ্ট কোনও দক্ষতা যদি কোনো শ্রমিকের থাকে যেটা তিনি প্রয়োগ করতে পারেন এমন কোনো জায়গায় যেখানে তাঁর সেই নির্দিষ্ট এক্সপারটিজ-টা লাগবে সেটা এক প্রকার। কিন্তু একজন নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করার ক্ষেত্রটা অনেক ব্যাপ্ত। মানে যেকোনও রাজ্যেই সেটা হতে পারে। তাঁর নিজের রাজ্যেও সেটা ঘটতে পারে, নিজের জেলাতেও সেটা ঘটতে পারে। সেটা আমি যদি ইন্টারপ্রিট করি এই পরিসংখ্যানটা দেখেই, তাহলে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে নির্মাণ শ্রমের মতো শ্রমের ক্ষেত্রেও একটা কিছু ক্রাইসিস পশ্চিমবঙ্গে থেকে থাকতে পারে, যে জন্য এই নির্মাণ শ্রমের মতো একেবারে মৌলিক দক্ষতা যে শ্রমিকের, তাঁকেও শিফট করতে হচ্ছে। সেটা মজুরির কারণে হতে পারে, অন্য কোনও কারণ-ও থাকতে পারে। আমিও যে খুব কার্যকারণ সম্পর্কের কথায় যেতে চাইছি এমনটা নয় কিন্তু মোটের ওপর পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে অন্তত সেইটুকু দেখা যাচ্ছে।

মৈত্রীশ ঘটক: আমি ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে ফ্রেম করছি যাতে আপনি যেটা বলছেন তার কিছু কিছু এলিমেন্ট নিশ্চয়ই প্লসিবল। কিন্তু আমরা অর্থনীতির একদম স্ট্যান্ডার্ড যে ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে এই বিষয়গুলো দেখি সেটা হলো

লেবারের ডিমান্ড আর সাপ্লাই। যে রাজ্যে হঠাৎ খুব ইকোনমিক বুম হবে সেখানে মজুরি বাড়বে, শ্রমিকের চাহিদা বাড়বে। যেমন একটা সময় মিডল্ ইস্ট-এ হয়েছিল বলে প্রচুর ভারতীয় সেখানে গিয়ে নানান ক্ষেত্রে কাজ করছেন। একটা সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানিতে হয়েছিল। জার্মানিতে পঞ্চাশের দশকে অনেক বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার গিয়েছিলেন। বিলেতে একটা সময় এনএইচএস-এর জন্য অনেক ডাক্তার গিয়েছিলেন। আমেরিকাতেও হাই স্কিল মাইগ্রেশন একসময় হয়েছে। এটা একটা দেশের মধ্যে, রাজ্যের মধ্যেও হয় অবশ্য। বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় চলে আসছে, সেরকম ব্যাপারও তো সবসময়ই হয়। এইটা যখন হয় তার পেছনে অনেকগুলো বিষয় কাজ করে। একটা ধরুন ডিমান্ড সাইড ফ্যাক্টর। ডিমান্ড হচ্ছে কতটা কর্মসংস্থান হচ্ছে যে আমি স্থানীয় শ্রমিকদের দিয়ে সেটাকে পুরো মেটাতে পারছি না। তখনই তাহলে আমাকে অন্য রাজ্যে দেখতে হবে। শ্রমিকদের তো কন্ট্রাক্টর থাকে, তারা খবর দেয়, সামাজিক নেটওয়ার্কের কিছু ভূমিকা থাকে। শুনতে পাওয়া গেল হয়তো বিহারের কোনো একটি গ্রামের কোনও পরিযায়ী শ্রমিক সে কলকাতা থেকে বলছে, হ্যাঁ, চলে এসো, কারণ এখানে এই ধরনের কাজের সুযোগ আছে, তোমার হয়ে যাবে। তখন তার গ্রামের লোকটি চলে আসে। এইভাবে এটা সাপ্লাই সাইড এবং এখানে খানিকটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে যে আমি আর একটু ভালো রোজগার করব, আর একটু ভালো থাকব, বাড়িতে টাকা পাঠাব, খানিকটা আবার প্রয়োজনের তাগিদ। আমরা যেটাকে পুল ফ্যাক্টর আর পুশ ফ্যাক্টর বলি, সেটা সবসময় আলাদা করা যায় না। কিন্তু আমরা তো জানি না যে "আমি কিছুই পাচ্ছি না বলে চলে যাচ্ছি", নাকি "ওখানে অনেকটা ভালো সুযোগ সুবিধা তাই চলে যাচ্ছি", এই দুটো বিকল্প সম্ভাবনার আপেক্ষিক গুরুত্ব। আর ডিমান্ড ফ্যাক্টরটা বোঝা আর একটু সোজা। যেখানে কর্মসংস্থান বেশি হচ্ছে, হঠাৎ যদি কোথাও একটা শিল্প বা ব্যবসা বা কনস্ট্রাকশানের কাজ বা কমার্সের জোয়ার আসে, ধরুন, কলকাতায় যদি সামনের পাঁচ বছরের মধ্যে অনেক কিছু হচ্ছে এবং কলকাতার শহরতলি বা কাছাকাছি যে গ্রাম বা ছোট শহরে সেগুলো যদি ছড়িয়ে পড়ে, তার শ্রমের বাজারে একটা প্রভাব পড়বে। সেখানে দোকানপাট তৈরি হবে, ডোমেস্টিক হেল্পের চাহিদা বাড়বে, ডাক্তার থেকে শুরু করে অনেক কিছুরই চাহিদা বাড়বে। সমস্ত স্কিল লেভেলে এটা হবে। কিন্তু আবার আপনার প্রশ্নে ফেরত যেতে গেলে, এইটা আপনি একদম ঠিক ধরেছেন যে, এই যে ধরুন আমি অর্থনীতিবিদ হিসেবে লন্ডনে আছি, তার মানে কি দেশে থাকতে পারতাম না? নিশ্চয়ই একটা কোনও কারণ আছে, কাজের পরিবেশ তার একটা, পারিবারিক বা অন্য আরো অনেক কারণে মানুষ এই ক্যালকুলেশনগুলো করে। আবার অন্য কারোর ক্ষেত্রে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সবচেয়ে বড়ো চিন্তা হতে পারে। আবার এগুলোর নানা কম্বিনেশনও হতে পারে।

কিন্তু একটা বিষয় হলো, যে কাজের জন্যে লোকে মাইগ্রেট করছে সেটার স্কিল লেভেলটা কী? সেটা কি খুব স্পেসিফিক স্কিল, যেমন ইঞ্জিনিয়ার – ধরুন গুজরাটে নতুন বিশাল কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট হলে কিছু ধরনের ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিক্যাল লোকের ডিমান্ড হবে। এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকেই যারা খানিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা একদমই নিজের জায়গা থেকে যাব না এরকম পণ করে নেই, তারা অনেকেই তখন ভাববে যে গিয়ে চাকরি করি। আমাদেরও পরিচিত সার্কেলে তো আছে যে কারো বাবা অন্যত্র পোস্টেড ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বা ডাক্তার হিসেবে। একটা সময় তো বিহার, উত্তরপ্রদেশে মানে পশ্চিমা অঞ্চলে প্রবাসী বাঙালি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার-রা ছিলেন।

কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই জায়গাটাই আমার মনে হয়, দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। যে কাজের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আউটমাইগ্রেশন হচ্ছে সেগুলোর স্কিলগুলো খুব স্পেসিফিক স্কিল না। অর্থাৎ খানিকটা লো লেভেল স্কিল-এর ক্ষেত্রেও এটা হচ্ছে। এখন নিজের জায়গায় বা কাছাকাছি জায়গায় যদি অনেক অপরচুনিটি থাকত, তাহলে হয়তো এই প্যাটার্ন হত না। এটা একটা সম্ভাব্য ফ্যাক্টর যে, পশ্চিমবঙ্গে যদি খুব রমরমিয়ে শ্রমের বাজারটা চলত, তাহলে এই ধরনের সহজায়ত্ব যে স্কিলগুলো, সেগুলোর জন্য বাইরে যেতে হত না। আপনি ভাবুন না, একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে, আমার বাড়িতে কেউ রান্না করেন। তিনি তো রান্নাই করছেন। দারুণ রান্না করলে তিনি হয়তো কোনও ফাইভ স্টার হোটেলে শেফ-এর চাকরি পাবেন। সেটা বাদ দিচ্ছি, ধরুন এমনি বাড়িতে ডাল ভাত তরকারি যেরকম রাঁধেন, তার জন্য তিনি যদি কেরালায় যান তাহলে তার কী কারণ হতে পারে? হয় মজুরির তফাতটা অনেকটা, আর তা না হলে এখানে যথেষ্ট কাজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁরা যাচ্ছেন। এখন এখানে এটা বলেই আপাতত আপনার এই প্রশ্নের উত্তরের আমি ইতি টানছি, আপনার যদি অন্য কোনও ফলো আপ প্রশ্ন থাকে করবেন। আমরা মজুরির হারের বিষয়গুলো এখানে জানি না। এখানে আমরা শুধু দেখছি, ওই ট্রাফিকের মতো, কোন রাস্তায় বেশি, কোন রাস্তায় কম এবং কী ধরনের গাড়ি যাচ্ছে। আলোচনাটা সেটুকু। তার কারণ, যেখানে অনেক গাড়ি সেখানে অনেক কিছু ভালো হচ্ছে নাকি, তারা বাধ্য হয়ে ওই রাস্তাটা ধরেছেন, সেটা আমরা বলতে পারছি না। এটার সামারি হচ্ছে, আনস্কিলড জবস ইন কনস্ট্রাকশন বা ক্যাপিটাল গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং— এই লেবার ইনটেনসিভ সেক্টরগুলোতে আনস্কিল্ড লেবারদের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা বড় সংখ্যায় আউট মাইগ্রেশন হচ্ছে। ভারতের বাকি অংশের তুলনায়। মনে রাখতে হবে পুরো আলোচনাটাই আপেক্ষিক, কারণ সব রাজ্য থেকেই মাইগ্রেশান হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে হচ্ছে বলে পাঞ্জাব থেকে কেউ যাচ্ছে না, তা না। নিশ্চয়ই হয়, সব রাজ্য থেকেই সব ধরনের স্কিল লেভেলের ক্ষেত্রেই এটা হয়।

মার্কসবাদী পথ: শেষ প্রশ্ন আপনাকে করতে চাইছি, আমাদের রাষ্ট্রে ভারতের কথা যদি ভাবি, বিভিন্ন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সহ নানাবিধ ফিজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স তার সিটিজেনকে, সেটা ডিরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফার থেকে শুরু করে যাই হোক না কেন, সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল তার পোলিটিক্যাল ইডিওলজি বলুন বা কোনও একটি সরকার যে নীতিতে চলছে, বা তাদেরই খুব অভিনব সিদ্ধান্ত— এমনটা নয়। কারণ আমাদের কনস্টিটিউশনের ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস-এ লেখা রয়েছে যে, এই জাতীয় অ্যাসিস্ট্যান্স সিটিজেনকে দিতে হবে স্টেটকে, যদি ভালনারেবিলিটি থাকে স্টেট ডিসাইড করবে। সঙ্গে এটাও বলা আছে যে, ইকোনমিক লিমিটটা মাথায় রেখে। ফলে খুব নতুন চর্চা নয়, ওয়েলফেয়ার স্টেট-এ এই জাতীয় প্র্যাকটিসেস রয়েছে। আমাদের রাজ্যেও ৩০ বছর ধরে তো বটেই আমরা নানাবিধ ভাতা, সেটা বার্ধক্য ভাতা হোক বিধবা ভাতা হোক, বন্টন হতে দেখেছি। কিন্তু আরেকটা জিনিসও অবজারভেশনে আমাদের আছে যে, এই বছর দশেক বছর পনেরোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফারের মাধ্যমে ফিজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া— ইউনিভার্সাল, নিয়ার ইউনিভার্সাল নানান রকম ফর্মে— মাত্রা তুলনায় বেড়েছে। কিছুটা কন্ডিশনাল আছে বটে কিন্তু মাত্রাটা বেড়েছে। এক্ষেত্রে দর্শনগত কিছু তফাতও হয়তো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। অন দি আদার হ্যান্ড, যা নিয়ে আমরা এতক্ষণ নানান আলোচনা করেছি, সেই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং-এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি বেশ কয়েকটা ফিচার দেখি, তাহলে দেখব— ১৫ বছর আগের রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কমপালসারি এডুকেশনের মতো একটা আইন এল, যেটার ভিত্তি শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। তৎসত্ত্বেও শিশুশ্রম, নাবালিকাদের বিবাহের বাস্তবতা আছে। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে-৫ (২০১৯-২১ সালের) ডেটাতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি নাবালিকা বিবাহ হচ্ছে। সেই সময়ের ২০ থেকে ২৪ বছর বয়েসী মহিলাদের সঙ্গে সমীক্ষা করে দেখা গেছে ৪১.৬ শতাংশ— গোটা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ভারতে সেটা ২৩.৩। এই ফিচারগুলিও আছে। এনএফএইচএস ৫-এর পরিসংখ্যানে এগুলির যে কারণ দেখা যাচ্ছে, তাতে ইকোনমি-র প্রশ্ন খুব ইগনোর করা চলে না। শিশুশ্রম তো বটেই এমনকি এই ছোটদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার সঙ্গেও ইকোনমির যোগাযোগা আছে। একদিকে ফিজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সের বাস্তবতা, সরকারি নীতি, আরেকদিকে এই ভালনারেবিলিটিগুলি। এই সবটাকে যদি একসঙ্গে আপনি আলোচনা করেন…

মৈত্রীশ ঘটক: ভালো প্রশ্ন। তবে প্রথমেই বলে রাখি যে, আমি এই বিষয়গুলোতে অতটা ডিরেক্টলি নিজে গবেষণা করিনি। ফলে আমি এই বিষয়ে যেটুকু জানি সেটা অন্যদের কাজ পড়ে বা যেটুকু মিডিয়া রিপোর্টস ইত্যাদি পাই, তা থেকে। ফলে আমার উত্তরটা খানিকটা তাত্ত্বিক লেভেলে হবে। অর্থাৎ প্রথমত, আমাদের দেখতে হবে ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কী হচ্ছে। কারণ পৃথিবী পাল্টাচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই এখন ক্যাশ ট্রান্সফারের ব্যাপারটা এসে গেছে। সেটা ভারত বলেই যে শুধু হচ্ছে তা না এবং ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এটা আলাদা করে করছে, তা না। ২০১৮ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সোশ্যাল সেফটি নেট নিয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একটা চেঞ্জিং প্যাটার্ন অফ কম্পোজিশন অফ ভেরিয়াস ডিরেক্টেড ট্রান্সফার প্রোগ্রামস ফর দ্য পুওর দেখা যাচ্ছে । এটা নিয়ে আমি খানিকটা গ্লোবাল লেভেলের ডেটাগুলো জানি আমার নিজের কাজের সূত্রে। এটা সারা পৃথিবীতেই হচ্ছে।

এবার ক্যাশ ট্রান্সফার কাম্য, না কি কাম্য না, এই বিষয়ে আমার মনে হয় যে এখানে আমাদের অনেকেরই, যাঁরা খানিকটা তাত্ত্বিকভাবে বামপন্থার আদর্শ থেকে আসেন, তাঁদের এটা অনেক সময় সমস্যাজনক লাগে। এবং তাঁদের পয়েন্ট অফ ভিউ-টা আমি বুঝতে পারছি। তাঁরা বলছেন যে, ইট'স আ সিম্পটম অফ দ্য স্টেট, এসেনশিয়ালি ওয়াশিং ইটস্ হ্যান্ডস্ অফ দ্য আদার মোর প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটিস অফ এডুকেশন, হেলথ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইত্যাদি। আমার মনে হয় যে, এটাকে আরেকটু ফ্লেক্সিবিলি দেখতে হবে। কারণ, আপনি ভাবুন যে এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে যে কটা জায়গায় একটা ওয়েলফেয়ার স্টেটের কনসেপ্ট আছে— মানে কার্যকর আছে? আমাদের যে সেফটি নেট প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো সব মিলিয়ে একটা ভেরি ভেরি ইনিশিয়াল অ্যান্ড প্রাইমারি ফর্ম অফ আ ওয়েলফেয়ার স্টেট। মানে একদমই কুঁড়েঘরের মতো। সেটা অন্যত্র যেমন ধরুন সুইডেনে, যেটা হয়তো একটা বিশাল অট্টালিকা আছে, আমরা সেটা কোনও রকমে একটু একটু করে শুরু করেছি। সেখানে ক্যাশ ট্রান্সফার ব্যাপারটা যতটা শুনতে মনে হয় যে, আচ্ছা এটা কি বকশিস দেওয়ার মতো— সেটা কিন্তু না। আমার মনে হয় ওটা সত্যিই আমাদের কনসেপচুয়ালি একটু অন্যভাবে দেখা উচিত। তার কারণ ভাবুন আমরা যারা ধরুন ইউকে-তে থাকি, ট্যাক্স দিই এবং ওরা খানিকটা কেটে নেয় মাইনে থেকে বা তারপরেও যদি অন্য কোনও কারণে আপনি কোনো রিপোর্ট লিখলেন বা কিছুর জন্যে অর্থ পান সেগুলোর জন্যে আবার আলাদা করে কর দিতে হয়। যদি কালকে আমার আয় বন্ধ হয়ে যায়— আমি ধরুন অসুস্থ হয়ে পড়লাম বা এমন কিছু হল যে আমি কাজ করতে পারছি না— আমি কিন্তু কিছু অ্যাসিস্ট্যান্স

অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাব। এই ট্যাক্সের টাকায় যে সোশ্যাল সেফটি নেটের ব্যবস্থা আছে, তার থেকেই পাব। অর্থাৎ একদিক থেকে যেটা ভাবা যায় যে, এই ক্যাশ ট্রান্সফার ইজ আ নেগেটিভ ট্যাক্স। এবং আমেরিকাতেও যখন ইন্টারেস্টিংলি নিক্সনের আমলে চালু হয়েছিল, এবং সেটা করেছিলেন কিন্তু ফ্রি মার্কেট ইকোনমিক্সের একজন "মহাগুরু" মিল্টন ফ্রিডম্যান, যাঁরা সরকারে সব জায়গা থেকে সরে যাওয়া উচিত বলে মনে করেন, তাঁরা এই নেগেটিভ ইনকাম ট্যাক্সের কনসেপ্টটা বলেছিলেন। এবং সেটার আইডিয়াটা কিন্তু ভালো, ডিজাইনের দিক থেকে। এথিক্যাল ব্যাপারটা অন্য, কিন্তু তাহলেও এর মধ্যে একটা তো দরিদ্র কল্যাণের অ্যাসপেক্ট আছে। আপনি যখন সত্যি কোনও কারণে কাজ করতে পারছেন না বা অন্য কারণে অভাবে পড়েছেন, যেমন ধরুন, আপনি একজন গৃহবধূ এবং আপনার সন্তানকে মানুষ করতে হবে, কোনও কারণে হয়তো আপনার স্বামী চলে গেলেন বা তিনি আর নেই। ইমিডিয়েটলি অবশ্যই মহিলাকেও কিছু কাজ খুঁজতে হবে, কিন্তু সেখানে স্টেট যদি তাঁকে চাইল্ড অ্যাসিস্ট্যান্স বা এক ধরনের আনেমপ্লয়মেন্ট অ্যালাওয়েন্স দেয়, সেটাতে তার একটা আয় হবে এবং তাতে তিনি অ্যাটলিস্ট বেসিক খাওয়াপরার খরচটা চালাতে পারবেন। সেটার মধ্যে আমার মনে হয় যে এটা ইজ এথিক্যালি ডিফেন্সিবল। কারণ এটা জাস্ট আ নেগেটিভ ট্যাক্স। আমি যেমন ট্যাক্স দিচ্ছি, সেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে পাবলিক সার্ভিসকে ফান্ডিং— সরকারের টাকা তো আর সরকারের টাকা না, এটা তো আমরা ট্যাক্সপেয়ার বা সরকারি যে ওনারশিপে যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের রেভিনিউ থেকেই এগুলো আসে। ফলে সেই জায়গাটাকে দেখলে আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা আমাদের আরেকটু সিম্প্যাথ্যাটিক্যালি দেখা উচিত। এটা পশ্চিমবঙ্গ স্পেসিফিক না। এটা আমি বলছি কনসেপচুয়ালি ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে দেখা উচিত।

সমস্যার জায়গাটা হচ্ছে, এটা যদি অন্য দরকারি জিনিসের জন্যে বরাদ্দ অর্থ আস্তে আস্তে কমাতে থকে। সরকারের বাজেট তো সীমিত। এটা আমাদের বাড়ির বাজেটেরই মতো। আপনি এটাতে বেশি খরচ করলে অন্য জায়গায় কমাতে হবে। সেই জায়গাটাতেই আমার মনে হয় আমাদের নজরটা দেওয়া উচিত। এখন বলা উচিত যে, সেটা ভারতের ক্ষেত্রে বা রাজ্যের ক্ষেত্রে সরকারের যে আর্থিক ক্ষমতা, সেটা কি প্রপারলি ব্যবহার করা হচ্ছে? মানে সেটার কি পোর্টফোলিও কম্পোজিশনটা ঠিক হচ্ছে, নাকি একটু ক্যাশ ট্রান্সফার কমিয়ে সে টাকায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেমন রাস্তাঘাট, যাতে ভালো করা যায়, করলে ভালো হয়? রাস্তাঘাট ভালো করা মানে কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্তদের লাভ হবে বলে বলছিনা – শিল্প বাণিজ্য সমস্ত কাজেই তো গুড ইনফ্রাস্ট্রাকচার উইল বি আ পজিটিভ থিং এবং যারা চাকরি করেন বা সাধারণ শ্রমজীবী, ছোট ব্যবসায়ী তাঁদের সবারই এতে হেল্প হবে। বা এডুকেশন বা হেলথের মতো বেসিক সোশ্যাল সেক্টর সেখানে ব্যয় বাড়ানো যায়? এখন সেখানে যেরকম পরিসংখ্যান থাকলে এটা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের তুলনায় কীরকম করছে এবং সেটা সময়ের সাথে কিভাবে পাল্টেছে তা নিয়ে প্রামাণ্য কিছু বলা যেত, তা সহজলভ্য নয় কিন্তু তাহলেও সেটা আমার মনে হয় খুঁটিয়ে দেখার বিষয়। এবং এটা যদি ঘটনা হয়ে থাকে, পরিসংখ্যান নিয়ে যদি দেখা যায় যে, ধরুন এই রাজ্যের যে আর্থিক ক্ষমতা, তার একটা ডিসপ্রপোরশানেট অ্যামাউন্ট-ই ক্যাশ ট্রান্সফার স্কিমে চলে যাচ্ছে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই একটা আলোচনার বিষয় এবং খানিকটা সংশয় হবেই যে এটা ঠিক হচ্ছে কি না। কিন্তু এর বেশি আমি বলতে পারছি না, কারণ নানা রকম প্রকল্প হচ্ছে এখন যা বাকিদের মতো আমিও কাগজে পড়েছি, সেরকম কেরালাতেও এরকম আছে, তামিলনাড়ুতেও আছে — তামিলনাড়ু তো জয়ললিতার আমল থেকে এই ধরণের কিছু স্কিমের বেশ পায়োনিয়ার ছিল। তো সেটা আমাদের অবজেক্টিভলি দেখতে হবে এবং আই থিঙ্ক ইট'স আ ভেরি ভ্যালিড কোশ্চেন যে আর উই অ্যালোকেটিং দ্য মানি ইন আ সোশ্যালি বেনিফিশিয়াল ওয়ে। যেমন কর্মসংস্থান, যেটা আলটিমেটলি দারিদ্র দূরীকরণের সবচেয়ে বড় প্রকল্প, তাতে মানুষ স্বনির্ভরও হলো, তার সত্যিকার অর্থে সরকারসহ কারো কাছ থেকে টাকা নেওয়ার দরকার হলনা। আমি ওই ব্যাপারটা এইভাবে দেখব যে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই ওভারঅল স্কিমে যে এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে সেটা বাজেটের কতটা অংশ। ভারতের বাকি বিভিন্ন রাজ্যের এই খাতে যে খরচ হচ্ছে সেটা এভেইলেবল বাজেটের কতটা অংশ, এগুলোর তুলনা করলে এবং সময়ের সাথে কোথায় বেশি বেড়েছে এগুলো জানা গেলে আমার মনে হয় এটা নিয়ে আরেকটু কংক্রিট আলোচনা করা যাবে। আদারওয়াইজ জেনারেল লেভেলে এটুকুই বলার আছে।

আর আপনি বাকি যে সামাজিক সমস্যাগুলো বলছেন সেগুলো তো খানিকটা আপনি যে সার্ভেগুলো থেকে ডেটা কোট করছেন সেগুলো ডেফিনেটলি চিন্তার বিষয়। এবং আমার যেটা মনে হয় এটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন সত্যি, আবার পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়েও সারা ভারতের ক্ষেত্রেও সত্যি যে, ইকোনমিক ভাইটালিটি কিছু সোশ্যালি বেনিফিশিয়াল দিক নিয়ে আসে। যেমন ধরুন কোনো পরিবারে মা-বাবার হয়তো ফরমাল শিক্ষা হয়নি, তাদের ইচ্ছে আছে ছেলেমেয়েকে একটা ভালো স্কুলে পড়াবো, তাদের জীবন যেন আমাদের মতো না হয়, তারা অফিসে গিয়ে চাকরি করবে ইত্যাদি। আবারও তথ্য পরিসংখ্যান আমি যেহেতু ডিরেক্টলি দেখিনি, সেই জন্যে এখানে আপেক্ষিক চিত্রটা বলতে পারব না কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে, যেটা বলে আমি আলোচনাটা শেষ করব, এগুলো নিয়ে আমাদের খানিকটা অবজেক্টিভলি

আলোচনা করতে হবে এবং এই জিনিসগুলোকে ফোকাসে আনতে হবে। কারণ অনেক সময় যেটা হয় আমাদের যদি নানান জায়গায় বিতর্কগুলো দেখেন যেগুলো নিয়ে হচ্ছে, ৯০ শতাংশ জনগণের জন্যে সেটা কিন্তু অতটা রেলিভেন্ট না। আপনি যে কথাটা বললেন যে চাইল্ড লেবার, এটা আমরা যারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তাদের বাড়িতে অবভিয়াসলি ওইভাবে প্রবলেম না। কিন্তু গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে দরিদ্রদের মধ্যে ইট ইজ আ বিগ প্রবলেম। সেরকম ভালো স্কুল এবং ভালো হেলথের ব্যাপারটা, হাসপাতালের অবস্থা, চিকিৎসার অবস্থা— এইটা আমার মনে হয় যে আলোচনায় যত ফেরত আসে সেইটা ততই মঙ্গল। কারণ তা না হলে আমরা বড্ড ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছি উত্তপ্ত এমন সব বিতর্কে যা ফান্ডামেন্টাল দিক থেকে হয়তো আম জনতার জীবনযাত্রার মানের জন্যে অতটা প্রাসঙ্গিক থাকছে না।

(মার্কসবাদী পথ: আলোচনা এখানেই শেষ হল। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনায় সময় দেওয়ার জন্য। আজকের আলোচনা ছিল 'গত দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা' প্রসঙ্গে এবং নির্দিষ্টভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং সামাজিক বেশ কিছু উপাদান কীভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে, সেই সম্পর্কে। অধ্যাপক মৈত্রীশ ঘটককে ধন্যবাদ জানাই।)

মূল সাক্ষাৎকারের লিখিত সংস্করণ পাঠকের সুবিধার্থে সামান্য পরিমার্জিত হয়েছে।

সাক্ষাৎকার: উর্বা চৌধুরী